নিরঞ্জন ধর

বিদ্যাসাগর ও ইয়ংবেঙ্গল

'বিদ্যাসাগর' হল সংস্কৃত কলেজের একটা উপাধি। ঐ কলেজের একটি বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের এই উপাধি দেওয়া হত। সে দিক থেকে দেখতে গেলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বহু বিদ্যাসাগরেরই দেখা মিলত। আমরা কিন্তু আজ বিদ্যাসাগর বলতে একজন বিদ্যাসাগরকেই বুঝি। তিনি বলেন 'বীরসিংহের সিংহশিশু' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই একটি নাম আমাদের মনে স্বতই শ্রদ্ধার উদ্রেক করলেও সমকালীন বাংলার ভাবজীবনে তাঁর যে ভূমিকা ছিল তার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

বিদ্যাসাগরকে এতকাল আমরা মূলত একজন সমাজ-সংস্কারক হিসেবেই দেখে এসেছি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব যে, সমাজ-সংস্কারক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। যে সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় ভাবে জড়িত তা হল হিন্দুবিধবা বিবাহের প্রবর্তন। কিন্তু এই সংস্কার কি সত্যিই একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও সেদিন তার প্রয়োজনও কি খুব মস্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল? বিধবা বিবাহ প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমস্যা, কারণ নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে বিধবা বিবাহের একেবারে অপ্রচলন ছিল না। আর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যেখানে কুমারীদেরই বিবাহ হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার ছিল সেখানে বিধবা বিবাহ নিয়ে এতখানি মাতামাতি করার প্রয়োজন কতখানি ছিল তা বিশেষ করে অনুধাবনযোগ্য। বস্তুত এই সমাজ-সংস্কারের বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল না বলেই আইনের সাহায্য নিয়েও তা চালু করা গেল না। বিদ্যাসাগরের আমলে যে কয়েকটি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার জন্যও জামাই সংগ্রহ করতে তাঁকে অর্থানুকূল্যের টোপ ফেলতে হয়েছিল। কাজেই আমরা ঈশ্বরচন্দ্রকে এমন এক সংস্কার-আন্দোলনের নেতারূপে দেখতে পাই কার্যত যা ব্যর্থ হয়েছে।

তা ছাড়া, বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগরকে কতখানি কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী করেছে তাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে। একথা ঠিক যে বিধবা বিবাহের তিনিই প্রথম সমর্থক না হলেও তাঁর একক প্রচেষ্টাতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এর সমর্থনে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যেভাবে তিনি শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে যুক্ত করে এই আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিলেন তা আদৌ তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। ঈশ্বর ও শাস্ত্রে বিশ্বাসী রামমোহনের পক্ষে যা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক নিরীশ্বররাদী ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে ছিল তা একান্তই অসঙ্গত। স্পষ্টতই আশু ফল লাভের আশায় তিনি নীতিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, আশু ফল লাভেও তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমন কি, এতদিনের ব্যবধানেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিধবা বিবাহ আন্দোলনের উপর তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানেরও বিশেষ স্বাক্ষর পড়েনি, কারণ পরাশর সংহিতার যে শ্লোকটির (গতে মৃতে

ইত্যাদি) উপর ভিত্তি করে বিধবা বিবাহ বৈধীকরণ আইনটি পাশ করা হয় তিনিই তার দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এমন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকা নিবাসী রাজা রাজবল্লভ যখন নিজ কন্যার অকাল বৈধব্যে পীড়িত হয়ে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন বারাণসী, মিথিলা প্রমুখ হিন্দু সংস্কৃতির পীঠস্থানগুলির পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে ঐ সম্পর্কে মতামত আনিয়েছিলেন। সেই পণ্ডিত সমাজের কিছু অংশ বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় তা দেখাবার জন্য পরাশর-সংহিত্যের উল্লিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে (১৮৪৩ সালে) বিদ্যাসাগরের অল্প কিছু আগে নাগপুর রাজ্যের সরকারি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহের উপর যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতে ঐ বিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থন দেখাতে গিয়ে উক্ত শ্লোকটির উল্লেখ করেন। এই দুটি ঘটনা বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের অবদানকে যে অনেকখানি ম্লান করে দেয় তা অস্বীকার করা যায় না।

আবার, ঈশ্বরচন্দ্র যে সমস্ত শ্রেণীর লোককে তাঁর আন্দোলনের সামিল করতে পেরেছিলেন তাদের অধিকাংশের সততা ও ঐকান্তিকতা সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না। C. H. Heimsath-এর ভাষায়, "Widow remarriage movement attracted to its banner more transient reformers, curiosity seekers, and chronic infringers of the law than any other social reform cause."

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের প্রকৃত যে ভূমিকা তা সংস্কারক হিসেবে ততখানি নয়, যতখানি হল একজন সক্রিয় যুক্তিবাদী হিসেবে। বস্তুত তিনি ছিলেন সে যুগের ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদী শিবিরের শেষ মহাযোদ্ধা। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবর্গ এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকে দেশের মধ্যে যে এক শক্তিশালী যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ১৮৪৩ সালে এসে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ১৮৩২ সালে ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ডেভিড হেয়ার এই আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যদের মূল প্রতিষ্ঠান সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার (Society for the Acquisition of General Knowledge) তিনি ছিলেন ভিজিটার। ১৮৪২ সালে ওলাওঠা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইংলন্ড থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্য ও প্রখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসন কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন এবং দ্বারকানাথের মাধ্যমে যোগাযোগের ফলে তিনি ডিরোজিওপন্থীদের দেশের মধ্যে এক সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করলেন। ফলে তাঁরা বিপথে পরিচালিত হলেন। তাঁদের নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম হল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। রাজনীতিই এখন থেকে তাঁদের মুখ্য আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল এবং যে চিন্তাবিপ্লব ঘটানোর কাজ তাঁরা শুরু করেছিলেন তা উপেক্ষিত হল। সুযোগ বুঝে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনও পুনর্গঠিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের সেই দুর্দিনে ঈশ্বরচন্দ্র ডিরোজিওপন্থীদের পরিত্যক্ত পতাকা কাঁধে তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে, ডিরোজিওপন্থীদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের চেয়ে অসাদৃশ্যই বেশি। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, চাল-চলন—সর্ব বিষয়েই দু-পক্ষের মধ্যে প্রায় নক্ষত্রসুদূর ব্যবধান। বিদ্যাসাগর আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান

ছিলেন। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল যেখানে মূলত ভারতীয় বিদ্যাই ছিল তাঁর পঠিতব্য বিষয়। কলেজের পড়া শেষ করে পুত্র নিজ গ্রামে একটা বিদ্যাপীঠ খুলবেন এই ছিল পিতা ঠাকুরদাসের ইচ্ছা। অপর পক্ষে ডিরোজিওপন্থীরা অধিকাংশই ধনীর দুলাল। তাঁদের পড়াশুনা সব হিন্দু কলেজে ও ইউরোপীয় বিদ্যায় তাঁরা সুপণ্ডিত। বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবস্থার কালে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ একই অট্টালিকায় অবস্থিত হলেও দুই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ বিশেষ ছিল না, কারণ উভয় কলেজের মধ্যে ছিল কাঁটা তারের বেড়া। তাই ভাবলে আশ্চর্য লাগে, এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কী করে তিনি ডিরোজিওপন্থীদের উত্তরসূরী হয়ে দাঁড়ালেন।

১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন! এই বারো বছর হিন্দু কলেজেরও স্বর্ণময় যুগ ছিল। ডিরোজিওপন্থী ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন মোটামুটি এই সময়েই ঘটেছিল। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগ দেন ১৮২৬ সালে এবং তাঁর শিক্ষণের প্রভাব অনুভব হতে বছর দুই-তিন লেগেছিল। পরে আমরা দেখব, ১৮৪২ সাল থেকেই ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র অবশ্য ছাত্রাবস্থাতেই ডিরোজিও-অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রাচীর তুলে কখনও ভাববন্যাকে রোধ করা যায় না। এক্ষেত্রেও যায় নি। কাঁটা তারের বেড়া ডিঙ্গিয়েও সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মাঝে মাঝেই মারামারি লেগে যেত। মূলত ঐ সঙ্ঘাত ছিল দুটি বিপরীতধর্মী ভাবধারার সংঘাত। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে কিন্তু এই সংঘাত এক বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিল। বংশ পরম্পরায় তিনি খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সমাজের পণ্ডিতদের অনেকে নব্য ন্যায় চর্চায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যে পিতামহ রামজয়ের প্রভাব ঈশ্বরচন্দ্রের উপর সবচেয়ে বেশি পড়েছিল তিনি ছিলেন একজন তর্কভূষণ। সংস্কৃত কলেজে নব্য ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের পঠিতব্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল এবং তদানীন্তন কলেজ অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের কথায় জানতে পারি যে, তিনি বেশ যত্নের সঙ্গে তা অধিগত করেছিলেন। নব্য ন্যায় ছিল বেদ ও বেদান্তের-বিরোধী। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বুদ্ধবাদ মুছে যাবার পরও প্রায় চারশো বছর ধরে তা বাংলাদেশে সগৌরবে বিরাজমান ছিল। এই বেদবিরোধী আবহাওয়ায় বুদ্ধবাদী নৈয়ায়িক প্রভাকরের মতবাদের প্রভাবে নব্য ন্যায়ের জন্ম হয়। কট্টর হিন্দুদের কাছে বেদ-বেদান্তই হল সমস্ত জ্ঞানের আকর এবং বেদ-বেদান্তে যার অনুমোদন নেই তা কখনও সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না। নব্য ন্যায় এই মনোভাবের প্রতিবাদস্বরূপ জানাল, যুক্তিও ন্যায়ের বিচারই হল সবচেয়ে বড়ো বিচার। কাজেই যে কোনো ভাবকে সত্য বলে পরিগণিত হতে হলে তাকে যুক্তির বিচারে প্রমাণিত হতে হবে। প্রত্যক্ষীকরণ, উপমান ও শব্দ (ভাষার যথার্থতা) হল এই প্রমাণের ভিত্তি। ব্রহ্মের ধারণা কোনো বুদ্ধিজাত ধারণা নয়, ন্যায় যুক্তিকে অবলম্বন করে তা গড়ে ওঠেনি। সুতরাং তাঁর সত্যতাও স্বীকার্য হতে পারে না। নব্য ন্যায়ের এই শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সহধর্মিতা লক্ষণীয়। তবে নব্য ন্যায় আন্দোলনের ত্রুটি ছিল এই যে, যদিও বাস্তব পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ন্যায়ের জন্ম তবু তার যুক্তি বিচারকে বাস্তব পৃথিবীতে প্রয়োগ করে প্রকৃতির রহস্য সন্ধানের কাজে ব্যবহৃত করা হয় নি। তাই নব্য ন্যায়ের পণ্ডিতদের এক সৈন্যদলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যারা কেবল অস্ত্রশস্ত্র শাণ দিয়েই কাটাল কিন্তু কার্যকালে রইল রণক্ষেত্রে অনুপস্থিত। সেদিক

দিয়ে দেখতে গেলে, আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা হল আমাদের নব্য ন্যায়ের-ই পরিণত রূপ, কারণ নানা আধুনিক জাগতিক মান আমরা এই শিক্ষার মাধ্যমেই পেতে শুরু করি। একই সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রায় একই সময়ে শুরু হলেও তার বিরাট প্রভাব কলকাতা ও বাংলাদেশে যেমন তৎক্ষণাৎ অনুভূত হয়েছিল ভারতবর্ষের অন্য দুটি প্রেসিডেন্সিতে তা হয় নি কেন? বুদ্ধবাদের তিরোধানের পরও নব্য ন্যায় চর্চা বাঙালি মানসভূমিকে যেমন উর্বর রেখেছিল বোম্বাই ও মাদ্রাজের বেলায় তা ঘটেনি। ইংরেজি শিক্ষা তাই এখানে সহজেই ফলপ্রসূ হতে পেরেছিল। পুরাতন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো অভাবনীয় ধারায় সমাজ কখনও এগিয়ে চলে না।

নব্য ন্যায়ের ছাত্র বিদ্যাসাগর যে হিন্দু কলেজের ছাত্র, বিশেষ করে ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যে 'আত্মার দোসর' খুঁজে পাবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? বস্তুত রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিক মল্লিক, রাধানাথ শিকদার—প্রমুখ বিশিষ্ট ডিরোজিও শিষ্য ও সহযোগীদের সঙ্গে সেদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। এমন কি, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যে সভ্য-তালিকা সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র এই সভারও একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং এর আয়োজিত প্রায় সকল আলোচনা-সভাতেই উপস্থিত থাকতেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের অনুপ্রেরণাও তিনি এখান থেকে লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়, কারণ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার ও তার মুখপত্র বেঙ্গল স্পেকটেটরের (Bengal Spectator) আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বিধবা বিবাহ বিতর্কও ছিল।

পরে ডিরোজিওপন্থীরা প্রায় সবাই ভারতীয়দের হাতে কিছু কিছু ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিস্ট ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম বা থিওসফির আশ্রয় গ্রহণ করলেন, আবার কেউ কেউ জীবিকা-উপলক্ষে দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। ডিরোজিও-শিষ্যদের ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন এমনই অকালে নিঃশেষিত হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। সে সময়ে দেশের মধ্যে যে সব ধর্ম-আন্দোলন চলছিল তা কিন্তু কখনও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ধর্মের দ্বারা দেশের কোনো উপকার সাধিত হবে বলেও তিনি মনে করতেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর ভাবধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ *সোমপ্রকাশ* একাধিকবার এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, দেশের কিছু শিক্ষিত যুবক ধর্ম ধর্ম করে উন্মাদ ও অকেজো হয়ে গিয়েছে যদিও দেশের তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব খানিকটা সংস্কৃত কলেজে তাঁর ন্যায়-শিক্ষক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অনুরূপ ছিল বলে মনে হয়। কেশব সেনের উদ্দাম ধর্ম চর্চাকে লক্ষ করে জয়নারায়ণ মন্তব্য করেছিলেন—"কেশব 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করে এত চেঁচামেচি লাগিয়েছে কেন? গত কয়েক হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে অনেক ঈশ্বর চর্চা হয়েছে, কিন্তু তাতে দেশের কতটুকু মঙ্গল হয়েছে? এ সব না করে কেশব যদি দেশের মধ্যে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা করত তাহলে কাজ হত।" শিক্ষা-গুরু ব্রাহ্ম-ধর্ম সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন অন্য সমস্ত ধর্ম-আন্দোলন সম্পর্কেও নিশ্চয় তা প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু সমকালীন ধর্ম-আন্দোলনগুলির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনোভাব আরও স্পষ্ট করে ধরা পড়ে বেদান্তের প্রতি তাঁর মনোভাব থেকে। বিভিন্ন পর্যায়ের ব্রাহ্ম-আন্দোলন প্রধানত বেদান্তকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। এমন কি, যে কেশবচন্দ্র তাঁর

খ্রিস্ট ধর্ম প্রীতির দরুণ 'ভারতীয় খ্রিস্ট'—এই আখ্যা লাভ করেছিলেন তিনিই শেষ অবধি বেদান্তে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ আন্দোলনের দিক দিয়ে তাই বাংলার গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীকে বৈদান্তিক শতাব্দী বলে অভিহিত করা হয়। এই বেদান্তের সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রের ধারণা কিন্তু আদৌ অনুকূল ছিল না। তাঁর শিক্ষা সংস্কার রিপোর্টে তিনি বেদান্তকে পরিষ্কার ভাষায় 'false philosophy' বলেছেন এবং যেহেতু সংস্কৃত কলেজ ভারত-বিদ্যা পঠন-পাঠনের কেন্দ্র এবং বেদান্ত দর্শনকে আমাদের দেশবাসী বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে সেইহেতু এই কলেজের পাঠক্রম থেকে বেদান্তকে বাদ দেওয়া সম্ভব না হলেও এই দর্শনের বিপরীত ধর্মী পাশ্চাত্য দর্শন পাঠের ব্যবস্থা করতে তিনি বলেছিলেন যাতে দেশবাসীর মনে বেদান্তের প্রভাব খর্ব হয়। সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্রের এই বৈপ্লবিক ঘোষণা দেশের সমসাময়িক ধর্ম-আন্দোলনগুলির প্রতি তাঁর প্রকৃত মনোভাবের পরিচায়ক।

কেবল জাতীয় জীবনেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও বিদ্যাসাগর কোনো ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তিনি কোনো দিন কোনো দেবতার কাছে মাথা নত করেননি। তাঁর বাড়িতেও কখনও কোনো পূজার আয়োজন ছিল না। এমন কি, সন্ধ্যা-গায়ত্রীও তিনি জপ করতেন না। ধর্ম সম্বন্ধে নানা বক্রোক্তিও তিনি সময়ে সময়ে করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *Men I have Seen* গ্রন্থে এমন একটা বক্রোক্তির সরস বর্ণনা দিয়েছেন। শিবনাথের পিতা হারান ভট্টাচার্য ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি নৈষ্ঠিক হিন্দুদের প্রথানুযায়ী কাশীবাসী হয়েছিলেন। কোনো এক কাজে তিনি একবার কলকাতায় এসে আবাল্য বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন—"কী হে হারান, কাশীতে গাঁজা-টাজা টানতে শিখেছ তো?" শিবনাথের পিতা হকচকিয়ে গিয়ে এই অদ্ভুত প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর বললেন—"কাশীতে মরলে শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় এই আশায় কাশীবাসী হয়েছ তো? কিন্তু জান তো শিব একজন কুখ্যাত গঞ্জিকাসেবী। কাজেই আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে পরে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে।" শোনা যায়, বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী নাকি পূজা-আর্চায় পূর্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন—"বাঁশ, খড় ও কাদার ঠাকুরকে পুজো করে কী হবে? আমি নিজের হাতে যাকে তৈরি করেছি সে কী করে আমাকে বাঁচাবে?" ভগবতীর পিতৃকুলও ছিল নৈয়ায়িক এবং নৈয়ায়িকদের মত সাধারণত তুলনামূলকভাবে সংস্কারহীন হয়। তাঁরা অনেক সময় পরিবারের মহিলাদের উচ্চশিক্ষাও দিতেন। কাজেই প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার প্রতি যে অনীহা বিদ্যাসাগর দেখিয়ে এসেছেন তার মূলে মায়ের প্রভাব কতখানি ছিল তা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই ছিলেন যুক্তিবাদের এক জীবন্ত প্রতিষ্ঠান।

ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তিবাদের ভিত্তিমূল এমন শক্ত ছিল বলেই তিনি বিপথে পরিচালিত হননি। প্রধানত সাহিত্যচর্চার ভেতর দিয়েই তিনি দেশবাসীর মনে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ১৮৪৭ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত এই ষোল-সতেরো বছর তিনি সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাই যে সমস্ত রস-সাহিত্য রচনা বা অনুবাদ করেছিলেন সেইগুলির কথাই সাধারণত আমরা জানি। কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক বাংলা রচনাতেও হাত লাগিয়েছিলেন। এর সন্ধান আমরা অনেকেই রাখি না। ১৮৩৯-৪০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে ন্যায়

শ্রেণির ছাত্র তখন তিনি *ভূগোল খগোল বর্ণনম্* নামে একটি সংস্কৃত পুস্তিকা রচনা করে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই পুস্তিকায় আমরা বিদ্যাসাগরের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় বিজ্ঞানেই অধিকারের প্রথম পরিচয় পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কৃত কলেজে তখন প্রধানত ভারতীয় বিদ্যার পঠন-পাঠন চললেও ইয়োরোপীয় বিদ্যাতেও কিছু কিছু শিক্ষাদান চলত। চেম্বার্স-এর 'Exemplary Biography' অবলম্বনে তিনি পরে তাঁর জীবন চরিত শুরু করেন কিন্তু তা শেষ করেননি। তবে যে কয়েকজন মনীষীর জীবনী তিনি অনুবাদ করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিউটন, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, হর্শেল প্রমুখ বিজ্ঞানের পথিকৃৎরা ছিলেন। এর কিছু পরে ঈশ্বরচন্দ্র *বোধোদয়* রচনা করেন। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে নানা মনোজ্ঞ আলোচনা আমরা এখানে দেখতে পাই। চেম্বার্স-এর 'Rudiments of Knowledge' ছিল বইখানির ভিত্তি।

ধর্মচিন্তার সঙ্গে যুক্তিবাদের লড়াই সেদিন ঘনিয়ে উঠেছিল অবশ্য *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ পুনর্গঠিত হল ১৮৪৩ সালে। কিন্তু তার আগে ১৮৩৯ সালে তিনি স্থাপিত করলেন তত্ত্ববোধিনী সভা। এর পেছনে দেবেন্দ্রনাথের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুমূর্ষু ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনে বেগ সঞ্চার করা। কিন্তু সেই সঙ্গে এই সভা যাতে একটা জাতীয় চরিত্র লাভ করে সেদিকেও দেবেন্দ্রনাথ সচেষ্ট ছিলেন। ফলে জনা দশেক আত্মীয়-স্বজন ও ব্রাহ্ম বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যার শুরু হয়েছিল অচিরে তার সভ্যসংখ্যা হাজারের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল এবং ব্রাহ্ম, অব্রাহ্ম, নাস্তিক, শিক্ষাবিদ, বিচারক, সাংবাদিক, সাহিত্যসেবী প্রভৃতি হরেক রকমের লোক এসে এই নতুন প্রতিষ্ঠানে সমবেত হলেন। এই সভার জন্য তখন সুকিয়া স্ট্রীটে একটি পৃথক বাড়িও ভাড়ায় নিলেন। সভার আয়ও ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীমোহন মিত্র প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ডিরোজিওপন্থীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরও তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দিলেন। ভাবী সংঘর্ষের বীজ এখানেই উপ্ত হল।

আবার কয়েক বৎসর পরে ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ যখন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলেন তখনও তিনি একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন। এর বিঘোষিত উদ্দেশ্য হল ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার আন্দোলনে সহায়তা করা। কিন্তু এর উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক হলেও দেবেন্দ্রনাথ একে জাতীয় পত্রিকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কাজেই এর সম্পাদনায় ও পরিচালনায় এমন দু-এক জন লোককে নিযুক্ত করলেন যাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর আধিপত্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা অবিসংবাদিত হলেও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বা যে কোনো ধর্মের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকার সম্পাদক ও পত্রিকায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধাদি নির্বাচনের ব্যাপারে যে পাঁচজন গ্রন্থাধ্যক্ষ নিয়ে পেপার কমিটি গঠিত হল ১৮৪৮ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র হলেন তাঁদের একজন। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই এভাবে খাল কেটে কুমির নিয়ে এলেন।

ডিরোজিও যুগের পর তত্ত্ববোধিনীর যুগ মূলত প্রতিক্রিয়ার যুগ। রামমোহন যুগের পর ধর্মচিন্তা এই যুগে আবার আসর গরম করতে তৎপর হল। ঈশ্বরচন্দ্র সেই প্রতিক্রিয়ার পথরোধ করতে দণ্ডায়মান হলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার ভেতর দিয়ে মহর্ষি কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেই উদ্যোগী ছিলেন তা নয়, ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত হবার পর থেকে তিনি সভাকে

সমাজের একটি শাখায় পরিণত করতে উদ্‌গ্রীব হলেন। কিন্তু বাধা পেলেন ঈশ্বরচন্দ্রের কাছ থেকে। ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা পার্থিব বস্তুর আলোচনাতে তাঁর উৎসাহ সমধিক। সভার অধিবেশন প্রতি সপ্তাহে বসলেও উপাসনার ব্যবস্থা মাসে মাত্র একবারের বেশি করা সম্ভব হয়নি। প্রাক্তন ডিরোজিওপন্থীদের কেউ কেউ তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যশ্রেণিভুক্ত হলেও তাঁদের উৎসাহ তখন রাজনীতির দিকেই বেশি। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে বিদ্যাসাগরের বিশেষ কোনো প্রত্যাশা ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর নতুন সহযোগী হলেন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। মাত্র সভা পরিচালনাতেই নয়, পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ নির্বাচনেও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের সংঘর্ষ দেখা দেয়।

ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন। একই বছরে উভয়ের জন্ম। রাধাকান্ত দেবের বাড়ি যাতায়াতের সূত্রে এই দুই মনীষী পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হন। অক্ষয়কুমার তখন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদক। উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সে যুগে হিন্দু কলেজের পরই বোধ হয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারির স্থান ছিল। অক্ষয়কুমার ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ছিলেন, কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তাঁর কলেজীয় শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত পড়াশুনো করে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর সবচেয়ে আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানের প্রতি এবং একজন বস্তুবাদী লেখক বলে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার যখন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্ত তখনও তাঁর বস্তুবাদী চিন্তার খুব পরিপক্কতা ছিল বলে মনে হয় না। এই সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সময়কার লেখার মধ্যেও আমরা সৃষ্টি কর্তার উল্লেখ বার বার দেখতে পাই। অক্ষয়কুমার রামমোহনের একজন অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর অনুকরণে একটা আত্মীয় সভাও প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি 'অবিমিশ্র যুক্তিবাদ' বলতে ভাস্কর ও আর্যভট্ট, নিউটন ও লাপলাসের আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে মজেজ ও মোহাম্মদ, যিশু খ্রিস্ট ও চৈতন্যের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

কিন্তু সেসময় যতটুকু যুক্তিবাদ অক্ষয়কুমারের লেখায় প্রতিফলিত হত দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তাও অসহনীয় ছিল। তিনি প্রকাশের পূর্বে সেই লেখা থেকে যে যে অংশে তাঁর 'মতবিরুদ্ধ কথা' থাকত তা কেটে বাদ দিতেন। কেবল পত্রিকার সাহিত্যিক সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির জন্য তিনি সেকালে অক্ষয়কুমারকে সম্পাদনার কাজ থেকে অব্যাহতি দেননি। কাজেই তাঁর আধ্যাত্মিকতার চাপ অক্ষয়কুমারের পক্ষে একা সহ্য করা কতকাল সম্ভব হত তা বলা দুষ্কর, বিশেষ করে যখন তিনি দেবেন্দ্রনাথের বেতনভোগী ছিলেন এবং এই বেতনই তাঁর একমাত্র উপজীব্য ছিল।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্বাচিত হবার পর তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন অক্ষয়কুমারের হাতকে দৃঢ়তর করল। তিনি নিয়মিতভাবে অক্ষয় দত্তের লেখাগুলি সংশোধন করে সেগুলিকে তীব্রতর করে তুলতে লাগলেন। 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানুষের সম্বন্ধ বিচার' লেখাটিরও তিনি আগাগোড়া দেখে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় ধর্মসম্পর্কহীন প্রবন্ধাদি প্রকাশেই বিদ্যাসাগরের অধিকতর উৎসাহ দেখা গেল। ঈশ্বরচন্দ্রের উপর কথা বলা সেদিন মহর্ষির পক্ষেও নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, বিদ্যাসাগরের সংযুক্ত হবার ফলে পত্রিকাটির মর্যাদাও তখন অভাবিতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি যে পত্রিকার পক্ষে এক রকম অপরিহার্য ছিলেন সন

২০।৪।৪৯ তারিখের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় এক বন্ধুর লেখা চিঠি থেকে জানা যায়। বিদ্যাসাগরের লেখা ছাড়া *তত্ত্ববোধিনী*-র সৌষ্ঠব সেদিন অকল্পনীয় ছিল।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে উত্তাপ জমা হতে লাগল। ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বে পরিচালিত পেপার কমিটির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের চরম মুহূর্তে চরম সংঘর্ষ উপস্থিত হল মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর একটি বক্তৃতা উপলক্ষ করে। দেবেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতাটি সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও গ্রন্থাধ্যক্ষরা তা প্রকাশযোগ্য মনে করেননি। ক্ষুব্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে লিখলেন—"কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।" অপেক্ষাকৃত পরিমিত ভাষায় তিনি 'নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষদের' সম্পর্কে আগেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

এইভাবে ক্রমাগত যুক্তিবাদী শুষ্ক তর্ক-বিতর্কে মহর্ষির ভক্ত-হৃদয় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তিনি বিশ্রামের জন্য বেশ কিছুকাল হিমালয়ের শান্ত মহিমার বুকে আশ্রয় নিলেন (১৮৫৬-১৮৬৬)। পরে তিনি ফিরে এসে দেখেন অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। কেশবচন্দ্র ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করেছেন। এই উন্মাদনা দেখে দেবেন্দ্রনাথ খুশি হলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের পক্ষে সেখানে কাজ করা সম্ভব হল না। দু'জনেই সরে দাঁড়ালেন। ১৮৫৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা তুলে দিলেন। তিনি যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রতিষ্ঠান বজায় থাকবে তার তিনি পক্ষপাতী নন। এখন থেকে একমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কাজকর্ম চালাতে লাগলেন। বিদ্যাসাগরই ছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ সম্পাদক এবং এই সভা তুলে দেবার প্রস্তাবটিও তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। কোনো আর্থিক প্রত্যাশায় তিনি নিজেকে তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে যুক্ত করেননি। মতামতের ক্ষেত্রে কোনো আপসেরই তিনি কোনো দিন পক্ষপাতী ছিলেন না। এদিকে অক্ষয়কুমারও ১৮৫৫ সালে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদকের পদত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে তিনি যে আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রই তা থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ঐ সময় কলকাতায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন, প্রধান শিক্ষকের পদটি তিনি অক্ষয়কুমারকে দিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী আন্দোলনের শেষ বলিষ্ঠ কণ্ঠটি এমনই করে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ধর্মের কল্লোলিনী স্রোত সারা দেশকে গ্রাস করল। তাঁর নিরীশ্বরবাদী বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দীক্ষা তিনি ঠিক ডিরোজিওপন্থীদেরকাজ থেকে না পেলেও এবং নিজেও ঠিক ডিরোজিওপন্থী না হলেও তাঁদের সমভিব্যহারেই তিনি প্রথম যৌবন ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদী অভিযানের সামিল হয়েছিলেন। ডিরোজিওপন্থীরা কিন্তু মাঝ পথে অনেকেই বসে পড়েছিলেন কিংবা বিপথে পরিচালিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র পরাভূত না হওয়া অবধি তাঁর ঝাণ্ডা উঁচু রেখেছিলেন।

মাইকেল ঈশ্বরচন্দ্রকে 'প্রথম মানুষ' বলে সম্বোধন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু কেবল 'প্রথম মানুষ'-ই নন, সম্পূর্ণ অর্থে একজন মানুষ ছিলেন। নানা মানবিকতাগুণ সম্পন্ন হওয়া ছাড়াও মানুষের মহিমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদকে বড়ো করে তুলেছিলেন। তিনি মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোনও সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। মানব সেবায় ব্রতী হবার জন্যও তাই তাঁর জীবের ভেতর শিবকে প্রত্যক্ষ করার কোনও তাগিদ

অনুভব করেননি। অর্থাৎ তিনি একাধারে humanist ও humanitarian দু-ই ছিলেন। বিদ্যাসাগর-জীবনের ট্র্যাজেডি হল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে যোগ্য মর্যাদা পাননি। আমাদের ক্ষুদ্রতায় যেমন humanitarian বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে মানুষের উপর তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, তেমনই humanist বিদ্যাসাগরও স্বদেশে বিশেষ কোনো স্বীকৃতি লাভ করলেন না। অধ্যাত্মবাদের কুয়াশায় আমরা আমাদের দৃষ্টিকে আবার নতুন করে আচ্ছন্ন করে ফেললাম। জীবন-সায়াহ্নে তিনি যে তাঁর কর্মভূমি কলকাতা থেকে বহু দূরে সাঁওতালপল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তার মূলে ছিল শুধু মানবদরদী বিদ্যাসাগরেরই ব্যর্থতার হতাশা নয়, মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরেরও ব্যর্থতার হতাশা। বিদ্যাসাগরের সেদিনকার পরাজয় ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শক্তিরই পরাজয়। তার অশুভ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আমরা আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।